আমি যে সব ভূতেদের দেখেছি

লেখার নামটাতে একটু গলদ রয়ে গেল। ভূতেরা প্রায়শই অশরীরী। কাজেই "দেখা" বলতে যা বোঝায় - চোখ খুলে দু'চোখ ভরে দেখা - ভূতেদের বেলায় সেটা সব সময় হয়ে ওঠে না। এখানে "ভূত দেখেছি" কথাটা ভূতের আনাগোনা বা সান্নিধ্য অর্থাৎ উপস্থিতি উপলব্ধি করার অর্থে প্রয়োগ হয়েছে।

আজকাল ভূত দেখার চলন নেই। ভূতেদের গোষ্ঠীটাই লুপ্ত হতে বসেছে বলতে গেলে। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি, এই ধরুন সত্তর, ষাঠ কি পঞ্চাশ বছর আগের কথা, তখন ভূত দেখা এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার ছিল না।

তবে আমাদের পরিবারে তারও অনেক আগে থেকেই ভূত-টুত সংক্রান্ত সকল অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ব্যাপারকে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের পর্যায়ে ফেলা হত। শুনেছি আমার দাদামশাই নিজেই ভূত সেজে অমাবস্যার রাতে পাকুড় গাছে চড়ে নাকী সুরে শোলমাছের আবদার করতেন নিরীহ পথচারীদের কাছে। দাদামশাই তখন কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন। ছুটিতে গ্রামে এসে ওই সব দুষ্টুমী করতেন। অন্ধকার গ্রামের পথে দাদামশায়ের ওই বিকট বায়না শুনে একবার দাঁতকপাটি লেগে অজ্ঞান হয়ে গেছিল কেউ। দাদামশাই গাছ থেকে নেমে শুশ্রূষা করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন তাকে।

আমার বাবা তাঁর ছাত্রজীবনে মেডিকেল কলেজে এক সদ্য মৃত রুগীর সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে এক সহপাঠীকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন যে অল্পের জন্য প্রাণহানির দায় থেকে রক্ষা পান। এর পর এ ধরনের রসিকতা বাবা আর কখনো কারও সঙ্গে করেননি। আমার মা'ও দারুণ সাহসী ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। অথচ আমি বাড়ির ধারা পেলাম না। এর কারণ কি হতে পারে তা নিয়ে আমি অনেক ভাবনা-চিন্তা গবেষণা করেছি।

আমার মা বলতেন আমি নাকি জন্মাবধি ভীতু। ভীতুর ডিম। আমার একেবারে শিশুকালে আমাদের বাড়িতে একটা চাকর ছিল। সে নাকি আমাকে

একা পেলে নানা ভাবে ভয় দেখাতো। একদিন মা হঠাৎ ঘরে ঢুকে দেখেন ছেলেটা আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে আমার সামনে তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে আর আমি দোলনায় শুয়ে দুই চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত করে ওর দিকে তাকিয়ে আছি। এরপর ছেলেটাকে আমি একা থাকলে সে ঘরে ঢুকতে মানা করে দিয়েছিলেন মা। তবে আমার বিপদ কাটলো না। এর অল্পদিন পরেই মা আমার ঘরে ঢুকে দেখলেন জানলায় একটা কালো কুচকুচে কাক (বোধহয় দাঁড়কাক) বসে আছে আর আমি আতঙ্কে নীল হয়ে কাকটাকে দেখছি। মা আমার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বাবাকে ডাকলেন। বাবা তখন সবে হাসপাতালের ডিউটি সেরে ফিরেছেন। মার কোলে উঠে আমি ততক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে গেছি।

অনেক বছর পরে যখন এই ঘটনাটা আমার স্বামী ও ছেলেমেয়েদের শোনালাম ওরা ব্যাপারটাকে একটুও গুরুত্ব দিলো না।

বললো, "গায়ের রঙ নীল হল কি করে? ছোটবেলায় তুমি বুঝি খুব কালো ছিলে? ছবিতে কেষ্টঠাকুর যেরকম কালো?"

তবে আমার শাশুড়ি ভূত মানতেন। আমাকে আড়ালে বলেছিলেন, ওঁর ছেলের কান বাঁচিয়ে : একবার গরমকালে বারান্দায় বসে রান্না করছেন। ওসব অঞ্চলে দারুণ গরম পড়ে। সে সময় এখনকার মত বাড়িতে বাড়িতে ছিমছাম গ্যাসের চুলোর ব্যবস্থা ছিল না। কয়লা বা কাঠের আগুনের সামনে বসে রুটি বানানো কষ্টকর ব্যাপার, বিশেষ করে অপরিসর রান্নাঘরে। তাই রাতে বারান্দায় বসে রান্না করতেন মা। সেদিনও একমনে রুটি বেলে তাওয়ার উপর সেঁকছেন। হঠাৎ উপর পানে নজর গেল। উঠোনের উঁচু দেয়ালের উপর গলা অবধি ঘোমটা টানা লালপেড়ে শাড়িপরা একটি স্ত্রীলোক। মা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, ভয়ে গলা দিয়ে রা বেরুলো না। স্ত্রীলোকটি দিব্যি সেই খাড়া দেয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে মার চোখের আড়ালে চলে গেল।

আমি আমার শাশুড়ির কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলাম। ওঁদের বাড়িটার পিছনে অনেকখানি পোড়ো জমি ছিল। উঁচু উঁচু ক'টা তালগাছ ছিল বাড়ির গা ঘেঁষে। সেই পোড়ো জমির একপাশে তিনখানা বাড়ি বানিয়েছিল কেউ। এক ধাঁচের তিনটে সংলগ্ন বাড়ি, মাঝের দেয়াল কমন। বাড়ির সামনে রাস্তা। সেই বাড়ির একটায় থাকতেন এঁরা - মাঝেরটায় নয়, একপাশে। আমার মনে হল পোড়ো জমি ও তালগাছ যেখানে আছে সেখানে ভূত থাকাও বিচিত্র

নয়। লালপাড় শাড়িপরা ঘোমটা টানা স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় প্রেতাত্মা। নইলে অত উঁচু খাড়া দেয়াল বেয়ে কলাবৌ অমন নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে যেতে পারে কখনো?

আমার স্বামীর থিওরি আলাদা। তিনটি বাড়ির একটিতে সম্ভবত কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ চলছিল। সত্যিই এক কুখ্যাত প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা থাকতো সেখানে। বহুদিন পরে জানা গেছিল তাদের প্রকৃত পরিচয়। তারা হয়তো পুলিস ও স্থানীয় লোকেদের দৃষ্টি এড়াতে ওইভাবে ঘোরাফেরা করতো। ঘোমটা টেনে পেত্নী সেজে অনায়াসে প্রতিবেশীদের ফাঁকি দেওয়া যায়, সাধারণ অবস্থায় যেটা সম্ভব নয়।

আমার ভূতের ভয়ের মূলে হয়তো ছোটবেলার আরও অনেক ঘটনার প্রভাব দায়ী। আরায় আমাদের বাড়িতে চন্দুবহু (চন্দুর বউ) নামে একটি স্ত্রীলোক কিছুদিন কাজ করেছিল। আমার ছোটবেলার একটা ফটো আছে। আমি, দিদি ও চন্দুবহু এই তিনজনের ফটো। কোনও ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফার দরজায় এসে হয়তো শুধিয়েছে কেউ ফটো তোলাতে চায় কিনা। চায় না শুনে অনুনয় করেছে। এত বেলা অবধি দোরে দোরে ঘুরে এমন কাউকে পায়নি যে ফটো তোলাতে ইচ্ছুক। অন্তত বউনি হিসেবে একটা ফটো তুলতে দিলে লোকটার কিছু রোজগার হয়।

মা তাই শুনে অগত্যা চন্দুবহুকে বলেছে, "যা খুকুদের সঙ্গে নিয়ে তুই একটা ছবি তুলিয়ে নে।"

এই বলে মা ফটোগ্রাফারের মজুরি হিসেবে চার আনা (হয়তো বা আরও কম) পয়সা বার করে রেখে দিয়েছে রান্নাঘরের দাওয়ায়। ফটোর কথা কেন উঠলো পরে বলছি।

চন্দুর বউ যখনি আমাকে আড়ালে পেতো প্রাণ ভরে ভূতের গল্প বলতো। আরায় সে সময় গরমকালে প্রায়ই বিজলি চলে যেতো যখন তখন। গরমে প্রাণান্তকর অবস্থা। চন্দুবহু হাতপাখা চালাতে চালাতে সমানে একটার পর একটা রক্ত হিম করা ঘটনা খুব খুঁটিয়ে বর্ণনা করে শোনাতো আমায়। ওর প্রথম স্বামী নাকি ভূতের ওঝা ছিল, ভূত সমাজে যথেচ্ছ যাতায়াত ছিল তার। শুধু একটা শর্ত ছিল - অন্য কোন জীবন্ত মানুষ যদি তাদের ক্রিয়াকলাপ দেখে ফেলে তবে সেইক্ষণে ওঝার ঘাড় মটকে রক্ত খাবে ওরা। ভূতেরা নিজেরা না চাইলে কোন জীবন্ত মানুষ ওদের হদিস পাবে না। কিন্তু ওঝারা ব্যতিক্রম। শুধু তাই নয়, ওঝাদের বিশেষ ক্ষমতা থাকে, চারিদিকে একটা ভূত-ফ্রেণ্ডলি দেহঃজ্যোতি ওদের

ঘিরে থাকে যে কারণে অন্য মানুষও ওঝার সঙ্গী হয়ে ভূতরাজ্যে ঢুকে পড়তে পারে বেআইনি ভাবে। শেষ অবধি সেটাই হল। রাত বিরেতে চন্দু প্রায়ই নিখোঁজ হয়ে যায়। চন্দুর বউয়ের ঘোর সন্দেহ হল স্বামীর হয়তো অন্য কোন নারীতে মতি হয়েছে, তাকেই ঘরে এনে বসাবে এবার।

চন্দুর বউ ব্যাপারটার তলদেশে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে এক রাতে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো। রাত তিন প্রহরে চন্দু উঠে বউয়ের কাছে এসে দেখলো বউ গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। হালকা নাক ডাকার মত নিঃশ্বাস বইছে তার। চন্দু নিশ্চিন্ত মনে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লো। ভূত চতুর্দশীর রাতে শ্যাওড়াতলায় জমিয়ে ভোজ বসেছে। রাজ্যের যত ভূত এসে জুটেছে সেখানে। চন্দুর থেকে বিশ বাঁও দূরত্ব রেখে অন্ধকারে নিঃশব্দে পিছু পিছু এসে চন্দুর বউ শ্যাওড়াগাছের আড়ালে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুটঘুট্টে অন্ধকার চারিদিকে। ভূতগুলো চন্দুর সঙ্গে ব্যবহার করছে যেন কিছুই হয়নি, সবকিছু অন্যবারের মতই আছে। শুধু খানাপিনার পর শেষপাতে যখন স্পেশাল আইটেম ঘোষণা করা হ'ল, "ওঝার তাজা রক্ত" তখনই চন্দু বুঝলো যে সর্বনাশ হয়ে গেছে। পর মুহূর্তে সব শেষ। মড়ার খুলিতে ওঝার রক্ত ঢেলে নিয়ে ভূতেদের উদ্দাম মাতামাতি শুরু হয়ে গেল। চন্দুর বউকে পরদিন উন্মাদ অবস্থায় শ্যাওড়াতলার লাগোয়া রাস্তায় বিবসনা ঘুরে বেড়াতে দেখে শহরের মিশনারী স্কুলের বাসে করে সরকারী হাসপাতালে ছেড়ে দিয়ে এলো স্কুল বাসের ড্রাইভার।

ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফারের ফটোয় আমার বয়স ছয়। দিদির নয়। আমাদের দু'জনের কাঁধে দুই হাত রেখে চন্দুর বউ আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কি কিম্ভুতকিমাকার ছবি তিনজনের, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আমি জানি আমার এবং আমার দিদির ছবি খুব খারাপ উঠেছে কারণ আমাদের চেহারা সত্যি সত্যি ওরকম নয়। (আমাদের মা যে কত মহানুভব ছিলেন, এই ফটোখানাই তার প্রমাণ। ওই বিদ্‌ঘুটে ছবিটা দেখার পরও বউনি মজুরির পয়সা চুকিয়ে দিয়েছিলেন ফটোগ্রাফারকে। সবাই পারতো না)।

এই ফটোখানার উল্লেখ করার কারণ এই : চন্দুর বউকে আমি বড় হয়ে আর দেখিনি। ওর চেহারা কেমন ছিল ফটোর বাইরে, তার কোনও নিদর্শন নেই আর। ফটোর চন্দুর বউ কি মানবী? নাকি শ্যাওড়াতলার ভোজে ওঝা ও তার অপরাধী স্ত্রী দু'জনেরই একই গতি হয়েছিল? হয়তো ভোজে সমাগত অতিথিদের

কেউ - কোনও কৌতুকপ্রিয় প্রেতাত্মা - চন্দুর বউয়ের পরিচয়ে আমার সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে গেল। ভীতু মেয়েটাকে চিরদিনের মত চিহ্নিত করে গেল, এই বুদ্ধিভিত্তিক জগতে ভূতে বিশ্বাসী ক্ষীয়মাণ উপজাতির শেষতম ধ্বজাবাহী রূপে।

ওই ফটোখানা তোলার কিছুদিনের মধ্যে বাবার ভাগলপুরে বদলি হয়। আমাদের ভাগলপুর যাবার দিন চারেক আগে চন্দুর বউ কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেল। আমার মা'র কাছ থেকে ও কিছু টাকা ধার নিয়েছিল এবং জোর করে মাকে একটা গেলাস রাখতে দিয়েছিল। মা রাখতে চাননি।

বললেন, "টাকা তুমি তোমার সুবিধেমত শোধ করে দিও। তার জন্যে কিছু গচ্ছিত রাখতে হবে না। আমরা তো আর মহাজন নই!"

চন্দুর বউ টাকা শোধ না দিয়েই কোথায় চলে গেল। বোধহয় টাকার অঙ্কটা সামান্যই ছিল, কারণ টাকার চিন্তার বদলে মা'র খারাপ লাগলো ওর গেলাসটা আমাদের কাছে রয়ে গেল বলে। আমি হঠাৎ জিদ ধরলাম গেলাসটা আমার চাই। মা ভারি অবাক হলেন। আমি ওরকম উট্‌পটাং জিদ কখনো করিনি। যা হোক, চন্দুর বউয়ের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। এমন কাউকে পাওয়া গেল না যার কাছে গেলাসটা দিলে চন্দুর বউয়ের কাছে জিনিসটা পৌঁছবে। কাজে কাজেই আমাদের কাছেই রয়ে গেল সেটা।

মা জানতেন না কেন ওই গেলাসটা আমার কাছে অমন মূল্যবান। চন্দুর বউ আমাকে বলেছে ওই গেলাস নাকি ওঝাগিরির অপরিহার্য অঙ্গ। যে কোনও নতুন ওঝা ভূতেদের কারবারে ঢোকার আগে একটা কোনও জিনিস চেয়ে নেয় যার শক্তি অপরিসীম। চন্দুর বউ বলেছিল ভূতেরা জানে না গেলাসটা কোথায় আছে। আমাদের বাড়ির হদিস পায়নি তারা। তা না হলে ভূতের দল কবে ওটা কেড়ে নিয়ে গিয়ে কায়দা মাফিক নিষ্ক্রিয় করে ফেলতো। ভূতেদের পক্ষে ও গেলাস শক্তিশালী টাইম-বম।

ভূতেদের সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলা হয়তো কোনদিন আমার হয়নি (যদি ধরে নিই চন্দুর বউ মানবী-ই, আমি ওর ফটো দেখে যা ভাবছি তা নয়) তবু জীবনভোর আমার আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করেছে ওরা, এমন জবরদস্ত বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন পৃষ্ঠভূমি হওয়া সত্বেও।

ছাত্রজীবনে ইংল্যান্ডে ভূতের উপদ্রব পোহাতে হয়নি আমায়। আমার মানসিক উৎকণ্ঠা আন্দাজ করে নিকট আত্মীয়রা (তারাই শুধু ব্যাপারটা জানতো, আমি ঘুণাক্ষরেও বাইরের কাউকে একথা জানতে দিইনি যে আমি ভূতকে ভয় পাই - বলা যায় না কেউ হয়তো তামাশা করতে গিয়ে খামোকা আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে আজীবন দাগী হয়ে থাকবে) আমায় আশ্বাস দিয়ে বললো, "তোমার কোনও চিন্তা নেই। ওদেশে সবাই আদব কায়দা মেনে চলে। ভূতেরাও নিয়ম মাফিক আলাপ না করিয়ে দিলে কেউ কারও দিকে চেয়েও দেখে না, কথা বলা তো দূরের কথা। অতএব কোনও ভয় নেই।"

ওদেশে একবারই কেবল ভূতের খবর পেয়েছিলাম। আমার এক বন্ধুর পোলিশ ল্যাণ্ডলেডীর প্রয়াত স্বামী নাকি প্রতি শুক্রবার স্ত্রীকে দেখতে ধরাধামে আসতো। তবে ভারী একনিষ্ঠ ভূত। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো দিকে চেয়েও দেখতো না। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে শুক্কুরবারে ও-বাড়িতে কখনো যেতাম না।

জার্মানিতে আমার মেয়ের বাড়িতে থাকাকালীন যে সব ভূতুড়ে ব্যাপার ঘটেছিল "অদ্ভূতুড়ে" গল্পে সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছি। এইবার ওই রকম আর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলে ইতি টানবো।

ছেলে লিখেছিল ফোর-বেডরুম বাড়ি কিনেছে। মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম। বছর দুয়েক পর ওদের বারংবার নিমন্ত্রণ এড়াতে না পেরে গিয়ে হাজির হলাম দু'জনে। এর আগেও ঘুরে এসেছি একবার। তখন দু'কামরার অ্যাপার্টমেন্টে থাকতো ওরা। ভাড়া বাড়ি। ভারী নিশ্চিন্ত জীবন। যখন যা খুঁত বেরোচ্ছে বাড়িতে, একটা টেলিফোনের ওয়াস্তা শুধু। সঙ্গে সঙ্গে হাউসিং কমপ্লেক্সের কর্মী এসে ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছে সব। ওদের পথ চেয়ে বসে থাকতে হয় না কাউকে। বাড়ি লক করে পূর্ব নির্ধারিত কার্যক্রম মত যে যেখানে খুশি যাওনা কেন, ওরা ঠিক সময়ে এসে নিখুঁত ভাবে কাজ করে চলে যাবে। ওদের কাছে 'মাস্টার কী' আছে, দোর খুলে ঘরে ঢুকবে আবার কাজ শেষ করে যাবার সময় 'মাস্টার কী' দিয়ে পরিপাটি করে বন্ধ করে দিয়ে যাবে। ভাবা যায়! তবু নিজের একখানা বাড়ি কিনতে পারা কৃতিত্বের কথা, তা সে ভাড়াবাড়িতে যত সুখই থাক না কেন।

ওখানে গিয়ে বাড়ির বিপুল কলেবর দেখে ঘাবড়ে গেলাম। ছেলে বললো "এটা অতি সাদা-মাটা মধ্যবিত্ত বাড়ি। পেল্লায় প্রাসাদের মত বাড়ি কেনার বাতিক আছে অনেকের। তারপর আর সামলাতে পারে না। মাসে মাসে বাড়ির কিস্তি শোধ করতে হিম-সিম খায়, প্রতিপদে পাই পয়সার হিসেব করে চলতে হয়। এই শ্রেণীর লোকেদের বলে "হাউস পুওর"। ভাল চাকরি বাকরি করে, মোটা মাইনে পায় অথচ ভিতর ভিতর গরীবের হদ্দ। আমরা ও সবের মধ্যে যাইনি। একটা মাঝারি গোছের বাড়ি কিনেছি নিজেদের ক্ষমতা বুঝে।"

ঘুরে ঘুরে দেখলাম বাড়িখানা। একটাই দোষ বাড়িটার, বিরাট বড়। একতলা, দোতলা আর বেসমেন্ট মিলিয়ে চোদ্দখানা ঘর, তাও তো দু'টো ছোট ছোট ভাঁড়ার ঘর ও সিঁড়ির নীচের ঘরখানা বাদ দিয়ে গুনেছি। শুনলাম তবুও নাকি বাড়িখানা ফোর-বেডরুম বাড়ি বলেই গণ্য হবে কারণ মাত্র চারখানা ঘরেই "বেডরুম"এর বিশেষত্বগুলো আছে (সংলগ্ন স্নান ঘর ও আরও কি সব যেন)।

সত্যি কথা বলতে কি, ওই বিশাল পুরীতে বাস করা মোটেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হল না আমার। এদের বাড়ি বারোমেসে বাসিন্দা বলতে আমার ছেলে সুদীপ আর বউমা রিতা আর একটা মাস তিনেকের বাচ্চা - আমার দাদুভাই টিঙ্কু । এই সওয়া দু'জন লোকের উপর দু'মাসের জন্যে আমরা এসে পড়েছি, দুই প্রৌঢ় প্রৌঢ়া। চোদ্দখানা ঘরের কি প্রয়োজন ভেবে পেলাম না।

আসলে আমার ভাল না লাগার অন্য কারণও ছিল। ভূতের ভয়। বাইরে প্রকাশ না করলেও ভূতের ভয়টা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি কোনদিন। যদিও ওকথা মনে আনি না; এই একটা প্রসঙ্গ সর্বতোভাবে এড়িয়ে যাই, এড়িয়ে এসেছি এতগুলো বছর ধরে। ভার্জিনিয়ার ওই বিরাট ফাঁকা বাড়িতে গিয়ে আবার ভয়টা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। কাউকে এ কথা বলার উপায় নেই। আমার আশেপাশের মানুষরা কেউ ভূতের "ভূ"তেও বিশ্বাস করে না। ইংল্যাণ্ডের কথা স্মরণ করে মনে মনে মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এ যে আমেরিকা! আনুষ্ঠানিক আলাপ পরিচয়ের ধার ধারে না কেউ। রাস্তায় অপরিচিত মানুষজন কাছে এসে হেসে হেসে গল্প করে, হাতে উপহার ধরিয়ে দিয়ে যায় অযাচিত ভাবে। এখানকার ভূত তো আমাকে দেখতে পেলেই এক লাফে ঘাড়ে চড়ে বসবে। হে ঠাকুর, কি যে করি!

হাঁটুর জন্যে আমার চলাফেরা সীমিত। সবাই জানে আমি বাড়িতে বসে বই পড়তে ভালবাসি। ছেলেমেয়েরা আমার পছন্দমত বই জোগাড় করে রাখে আগে ভাগে। নিজের সংসারে বই পড়ার সময় কমই পাই। বাইরে গেলে প্রাণ ভরে শখ মিটিয়ে নিই। আমার স্বামী ঘোরাফেরা করতে পছন্দ করেন। ছেলের ছুটি থাকলে নানারকম প্রোগ্রাম করে। নানান-দেশীয় রেস্টুরেন্টে খাওয়া, সিনেমা দেখা - এগুলোতে আমরা সবাই যাই। এ ছাড়া হুট হাট করে বাজার ঘাটে যেতে হলে আমি বাড়িতে থাকি। ওরা যায়।

বেসমেন্টে একখানা ঘরে নানারকম এক্সার্সাইজের সরঞ্জাম। রোজ মিনিট পনেরো ট্রেড-মিল ব্যবহার করতাম। হাঁটুর জন্যে ভাল। বাড়ির সামনে প্রশস্ত লন। মাঝে মাঝে সেখানেও হাঁটতাম। তবে ট্রেড-মিলটাই বেশী পছন্দ আমার।

বেসমেন্টটা অনেকখানি জায়গা নিয়ে। পুরো একতলার নীচেটা হ'ল বেসমেন্ট। বেসমেন্টে নেমেই একখানা হলঘর। দেয়ালের সঙ্গে সাঁটানো
এক সারি কাঁচের আলমারী ও বুকশেল্ফ। বইগুলো দেখতাম আর মনে মনে ঠিক করতাম কোনগুলো আগে পড়বো। সুদীপ বলেছে পছন্দসই বইগুলো বার করে এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে। ও উপরে আমাদের বেডরুমে এনে রেখে দেবে। বেসমেন্টে বই'এর আলমারীর সামনে এসে দাঁড়ালে তখন আর অন্য কোনও কথা মনে আসতো না। কোনও রকম ভয় করতো না। সে দিন প্রথম এর অন্যথা হ'ল।

আমেরিকার কিছু কিছু জিনিস আমার খুব খারাপ লাগে। আগেই বলেছি ওখানকার লোকেরা বড় বেশী ইন্ফর্মাল। ইংল্যাণ্ডের একেবারে উল্টো। আমি ইংল্যাণ্ডের রীতি-রেওয়াজগুলোই বেশী পছন্দ করি। যেমন আমেরিকার হলোইন পরবটা। কার মাথায় যে এসেছিল এই বিদ্ঘুটে বিপজ্জনক উৎসবের কথা! সেদিন আমরা সবাই মিলে রেস্টুরেন্টে থাই খাবার খেতে গিয়েছিলাম। আমি ও আমার স্বামী বিদেশী অজানা খাবার-দাবার তেমন পছন্দ করি না। কিন্তু ওরা যখন আগ্রহ করে নিয়ে যেতে চায় আপত্তি করতে খারাপ লাগে। তাই ওদের সঙ্গে যাই এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করি পরিবেশটা উপভোগ করতে। সুদীপ ও রিতা খুঁজে পেতে আমাদের জন্যে এমন সব খাবার আনায় যেগুলো ওরই মধ্যে আমাদের কথঞ্চিৎ পছন্দসই, পুরোপুরি না হলেও।

থাই রেস্টুরেন্টে যাবার পথে রিতা বললো, "হলোইন আসছে, আজ কিছু

কেনা-কাটা সেরে নিই বরং।"

আমার স্বামী খুব আগ্রহ দেখালো।

হলোইনের কেনা-কাটা সেরে যখন সবাই বাইরে এলাম, ভিতর ভিতর ভয়ে আধ-মরা হয়ে গেছি আমি। কি অমানুষিক প্রচেষ্টায় যে বাইরে একটা স্বাভাবিক চেহারা বজায় রাখতে পেরেছিলাম তা আমিই জানি। দোকান তো নয়, জায়গাটা যত পৈশাচিক সাজ সরঞ্জাম দিয়ে ঠাসা। চারিদিকে ভূত - পেত্নি - দৈত্যি - দানো - যক্ষ - রক্ষ - পিশাচের ছড়াছড়ি। পদে পদে ভয়ে মরে যাচ্ছি প্রতিক্ষণে। একটা সুদৃশ্য পাত্রে রঙ বেরঙের কাগজে মোড়া কুকি - টফি - লজেন্স রাখা আছে। সামনে নোটিসে গ্রাহকদের অনুরোধ জানাচ্ছে একটা মোড়ক তুলে নিতে। নোটিসের নির্দেশ মত পাত্রে হাত দেওয়া মাত্র একটা কঙ্কালের হাত এসে চেপে ধরবে গ্রাহকের হাতখানা। কঙ্কালের হাড্ডিসার হাতে সাঁড়াশীর মত জোর। চারিদিকের ভীতিজনক প্রতিমূর্তিগুলো স্থির নিশ্চল নয়। প্রোগ্রাম-মাফিক রক্ত হিম করা কর্মকান্ড (অট্টহাসি, আর্তনাদ, পৈশাচিক ডায়ালগ) চালু রয়েছে চারিদিকে। রিতা একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি পছন্দ করলো। ফ্রেমটা ঠিক একটা ঘুলঘুলির মত দেখতে। ঘুলঘুলির পেছনে পুরো মুখটা দেখা যায় না। সেই একাংশ দেখেই ভয়ে হৃদযন্ত্র বন্ধ হবার জোগাড় হ'ল আমার। যেন নৃশংস রক্তপেয়ী নরপিশাচ ঘুলঘুলি দিয়ে তার হবু শিকারকে দেখছে। চকিতে বহু বছর আগে দেখা "সাইকো" সিনেমার সেই ছবিটা মনে পড়ে গেল - নিরীহ মেয়েটি চান করছে। হত্যাকারী লুকিয়ে দেখছে হত্যার ঠিক আগে। রক্তের ধারা বয়ে যাবে এখনি।

আরও দু'দিন কেটে গেছে। সময় পেলেই বই নিয়ে বসি। বই ধন্বন্তরি, বই সকল রোগের দাওয়াই। শরীরের - মনের - আত্মার। সত্য - মিথ্যা - কাল্পনিক।

সেদিন একটু সকাল সকাল বেসমেন্টে গেছিলাম। হলঘর পার হয়ে বাথরুম, কাপড় কাচার ঘর, সুদীপের অফিস-রুম। অফিসের কাজ বাড়িতে করতে হলে এই ঘরটা ব্যবহার করে। তবে রোজদিন নয়। এমনিতে বন্ধই থাকে ঘরখানা। ব্যায়ামের সাজ সরঞ্জাম যে ঘরে, তার পাশে বেশ বড় একখানা ঘর আছে। কয়েকটা খালি স্যুটকেস ও দু'টো কাঠের বাক্স এক পাশে লাইন দিয়ে রাখা। বাকি ঘরটা খালি। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অব্যবহৃত ঘরের সোঁদা গন্ধ নেই। আমার স্বামীকে নিয়ে ওরা বেরিয়েছে। বাজার-ঘাট সেরে ভিডিও ভাড়া করে

আনবে। বাড়ি বসে সিনেমা দেখবো সবাই শনি - রবি দু'দিন। আমাদের পছন্দমত বই আসবে, সেকেলে ধরনের বই। বই বাছার জন্যেই বিশেষ করে বাবাকে সঙ্গে নিলো সুদীপ। আমি ভেবেছিলাম এই ফাঁকে ট্রেড-মিলটা সেরে নেবো। তাছাড়া আরও দু'একখানা বই নিয়ে যাবো বেসমেন্টের লাইব্রেরি থেকে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে খেয়াল হ'ল যে তখনও বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। এরপর ওরা এসে পড়লে আজও ট্রেড-মিলটা বাদ পড়বে। এক্সার্সাইজ রুমে যাবার পথে বাথরুম। কি মনে করে বাথরুমের দরজার হাতল ধরে ঘোরালাম। দরজাটা জাম হয়ে গেছে, খুললো না। বাড়িতে এরকম ব্যাপার প্রায়ই হয়। ছোটখাটো ব্যাপারেও স্বামীকে ডাকি : দরজা খুলছে না, জানলা বন্ধ হচ্ছে না, টি.ভি.র চ্যানেল পাচ্ছি না, আরও কত কি! ভাবলাম যাকগে, মিনিট পনেরো ট্রেড-মিল করে উপরে যাবো। বাথরুমের কমতি নেই এ বাড়িতে।

ট্রেড-মিলের স্পীডোমিটারে দেখা যাচ্ছে কতখানি হেঁটেছি। হাঁটার স্পীডও দেওয়া আছে। অন্যমনস্ক ভাবে পা ফেলে হাঁটছি, হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে দেখলাম। এঘরে গোটা তিনেক লাইট আছে, আমি কম পাওয়ারের আলোটার সুইচ টিপেছিলাম। সেই আলোতে দেখলাম ঘুলঘুলি দিয়ে এক জোড়া চোখ এদিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। চেঁচালাম না, ট্রেড-মিল থেকে লাফ মেরে নেমে ঊর্ধশ্বাসে দৌড় লাগালাম না। আরও দু-চার পা হেঁটে নিয়ম মাফিক ট্রেড-মিল থামিয়ে ঘর থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় হঠাৎ বুকের ধুক-পুকুনি খুব বেড়ে গেল; গতি ও শব্দ দু'টোই। সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে পড়ি কি মরি করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে লিভিং-রুমে ঢুকলাম। দরজায় লক লাগিয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলাম।

আমি নিজেকে যেভাবে জানি ও চিনি, এই গোটা প্রতিক্রিয়াটা আগাগোড়াই অন্য রকম। ঘুলঘুলিতে মুখটা দেখে আমার একমাত্র স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিৎ ছিল বিকট চিৎকারসহ পতন ও মূর্ছা। তা না করে আমি ঠাণ্ডা মাথায় ট্রেড-মিল ঠিক-ঠাক বন্ধ করে ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। আর এখন কেঁপে সারা হচ্ছি যখন পুরো ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। একেই বোধহয় বলে 'ডিলেইড শক'। যখন ভয় পাওয়ার কথা তখন ভয় পাইনি। এখন জানি ওটা কি। একটা ছবি দেখে ভয়ে মরে যাচ্ছি। নির্ঘাত রিতা মজা করার জন্যে ছবিটা

ঘুলঘুলিতে আটকে রেখে গেছে। ও জানে ওরা বেরিয়ে যাবার পর আমি ওঘরে যাবো। তাই আমাকে ভয় দেখাতে ওই কারসাজি করে গেছে। মনে মনে এত কথা যখন ভাবছিলাম তখনো মনের কোণে খটকা হচ্ছিল। রিতা তো ওরকম নয়! গত চার বছরে ওর সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছে তার সঙ্গে ওর আজকের ব্যবহার একেবারেই খাপ খায় না। কি জানি, হলোইন এত বড় পরব এ দেশে, এ সময় হয়তো এই রকম ঠাট্টা-তামাশা প্র্যাকটিক্যাল জোক আমেরিকার বাঁধা ট্র্যাডিশন। এতে দোষণীয় কিছু দেখে না ওরা।

বিকেলে আমার স্বামী প্রশ্ন করলো আমার শরীর ভাল আছে কিনা। অবাক হ'লাম হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে। তারপর কি ভেবে ওকে খুলে বললাম সব। ও বেসমেন্টে ঘুরে এসে বললো ও ঘরে দেয়ালে সেই ছবিটা ও দেখতে পেল না। রিতা কি তবে বাড়ি এসেই ওটা সরিয়ে ফেলেছে? কিন্তু বাড়ি ফিরে অবধি রিতা তো সমানে আমাদের দেখাশোনা করছে আর মাঝে মাঝে বাচ্চার দেখাশোনা করছে। বেসমেন্টে তো একবারও যায়নি রিতা! আমি বেসমেন্ট থেকে উঠে এসে সিঁড়ির দরজা লক করে দিয়েছিলাম। ওরা কেউ সে দরজা খোলেনি তারপর।

আমি রিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, "দোকানে সেই যে ছবিটা দেখালে ঘুলঘুলিতে এক জোড়া চোখ, সে ছবিটা আনোনি?"

রিতা বললো, "না মা, ছবিটা শেষ অবধি কিনলাম না।"

তারপর হেসে বললো, "জানো টেক্সাসে হলোইনে কি সব কাণ্ড করে লোকে? একবার আমাদের প্রতিবেশীর বেড়ার পাশে একটা যুবতীর লাশ পাওয়া গেল। হৈ হৈ কাণ্ড। পুলিশ এসে নেড়ে চেড়ে দেখে, ও হরি! মানুষ নয়, পোশাকের দোকানের পুতুল। হলোইন এলে ও সব অঞ্চলে বড় বুড়োরাও বুদ্ধি-সুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।"

বুঝলাম ভূতেরা এখানেও ধাওয়া করেছে আমাকে। কিন্তু এ নিয়ে আমি আর উচ্চবাচ্য করিনি।

****

কাগজে এই ধরনের খবর বেরোয় মাঝে মাঝে। অষ্ট্রিয়ায় একটা স্কুলের মেয়েকে কিডন্যাপ করে নিজের বাড়িতে বন্দী করে রেখেছিল কেউ অ - নে - ক বছর ধরে। আশেপাশের লোকেরা কেউ টের পায়নি। সেই সূত্রপাত। এর পর

যখন তখন যেখানে সেখানে অনুরূপ বা প্রায় অনুরূপ ঘটনা শোনা যেতে লাগলো। শেষমেশ শুনলাম সুদীপদের প্রতিবেশী ভদ্রলোকের এক আধ-পাগলা সৎ-ভাই নাকি তাদের বাড়িতে বহুকাল ধরে ছিল পাড়ার লোকের নজর বাঁচিয়ে।

বেকার - বাউণ্ডুলে, সারাজীবন সৎ-দাদার ঘাড়ে বসে খেয়েছে। তবে সহিংস, খারাপ টাইপের মানুষ নয়, শুধু বেশ খানিকটা পাগলাটে। ভাইকে নিয়ে ভদ্রলোকের বিড়ম্বনার শেষ নেই। বিদঘুটে সব কীর্তি-কলাপ করে আর তার ঠেলা সামলাতে নাজেহাল হয়ে যায় দাদা। শ্রীমান নাকি রাহুলদের বেসমেন্টে ঢোকার গুপ্ত পথ বানিয়েছিল। বাড়ির পিছন দিকে ব্যালকনির মত এক ফালি উঁচু জায়গা (ও দেশে "ডেক" বলে)। সেখানে রিতা বার-বে-কিউ করতো। কোন কোন দিন সান-শেডের তলায় বসে আমি বই পড়তাম চড়া রোদ আড়াল করে। সেই ডেকের তলায় সিঁদ কেটে যাতায়াতের রাস্তা বানিয়েছিল লোকটা। শেষে যখন জানা গেল বেসমেন্টে নিয়মিত যাতায়াত করছে, তখন টনক নড়লো সবার। দাদা সৎ-ভাইকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছে একটা সংস্থায়। সেখানে এ ধরনের লোকেদের দেখাশোনার ব্যবস্থা আছে।

আমার স্বামী বললেন, "তাহলে তুমি ঠিকই দেখেছিলে সেদিন। সত্যিই ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মারছিল কেউ। আমি হলফ করে বলতে পারি তুমি ভেবেছিলে ওটা ভূতের চোখ। তাই না?"